প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৫৬

প্রকাশক :
সন্ধ্যা সাহা
৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯

মুদ্রণ : অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সন্দীপন ভট্টাচার্য

সূর্যের উত্তরপুরুষ

মহারাষ্ট্রের দলিত কবিদের কবিতা সংকলন

মহারাষ্ট্রের 'দলিত-সাহিত্য'—এই বিশেষ নাম নিয়ে যে নিষ্পেষিত শ্রেণী-সাহিত্য আন্দোলন ১৯১৮ সাল থেকে পরাক্রমের সঙ্গে শুরু হয়, সেই আন্দোলনকে যাঁরা সমস্ত আবেগ যুক্তি এবং বিবেক নিয়ে সংগঠিত করেছেন, তাঁরা সবাই উঠে এসেছেন দলিত বা 'অচ্ছুৎ' সমাজের এক ব্যাপক অংশ মহার চামার মাতঙ্গ কুমহার ধাঙ্গড় এবং অন্যান্য নীচু বর্ণ থেকে। এই সমাজের ওপর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের যে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়ন, সেই নিপীড়ন স্বাধীনতা-উত্তরকালে স্বাভাবিক কারণেই আরও প্রবল হয়ে উঠেছে এবং এক সংঘাতময় রূপ ধারণ করেছে। এই সংঘাতময় রূপের পেছনে আছে নিরবচ্ছিন্ন শোষণের নির্মম প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বর্ণ হিন্দুরা ধর্মের 'মহান' আবরণে ঢেকে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবহমান কাল ধরে চলে-আসা হিন্দু ধর্মের এই বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে—যে প্রথা কায়িক শ্রমকে বিভাজন করে এক 'সুন্দর' এবং 'ছিমছাম' শোষণের কাঠামো সৃষ্টি করেছিল, আজ দলিত এবং নিষ্পেষিত মানুষ তারই বিরুদ্ধে তাঁদের মেধা প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তি নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

তাঁদের এই মেধা প্রজ্ঞা এবং শক্তি ছড়িয়ে আছে তাঁদের নিজেদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে—এমন নির্মম অভিজ্ঞতার ফসল বোধ হয় এর আগে কোন ভারতীয় সাহিত্যে আসেনি। তাই তাঁরা নিজেরাই একদিকে স্রষ্টা হয়েছেন, আর অন্যদিকে তাঁরা নিজেরাই স্রষ্টার সৃষ্টি হয়ে উঠেছেন।

স্রষ্টা এবং সৃষ্টির এই আত্মিক সম্পর্ক দলিত সাহিত্যে এমন এক অভীপ্সা, এমন এক ক্রোধ এবং মমতা নিয়ে হাজির হয়েছে, যা তাঁদের সেই বোধ নিয়েই অনুধাবন করতে হবে—বুঝতে হবে।

এই সংকলনে আমি যাঁদের কবিতা নিয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই আজ মহারাষ্ট্রের দলিত-সাহিত্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন এবং নিজ-নিজ চিন্তা এবং চেতনা নিয়ে লড়াই করছেন। আর এই লড়াই আজ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ক্রমেই প্রাজ্ঞ হয়ে উঠছে।

কমলেশ সেন

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সজাগ বিবেক
শ্রীমতী দেবী চ্যাটার্জীকে

যশবন্ত মনোহর

গতকালের যে বর্ষা

গতকালের যে বর্ষা,
সে বর্ষা
আমাদের গ্রামের ওপর অঝোরে ঝরেনি।

এই যে ফসল দেখছ,
এই ফসল
আমরা আমাদের চোখের ফোঁটা ফোঁটা জলে
রোপণ করেছি।

গতকালও আমাদের যুগল পাগুলো
রাস্তার কাছে
কোন নালিশ জানায়নি।

গাছগুলো জ্বলে-পুড়ে খাঁক,
আমাদের মুণ্ডুগুলো উধাও
নদীর পাড় ধরে
মৃত্যুকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা এগিয়ে গিয়েছি,
আর চিতার আগুন পিরহানের মতো
গায়ে চাপিয়ে
আমরা জীবনের কূলে কূলে ঘুরেছি।

গতকালের যে বর্ষা,
সে বর্ষা
আমাদের গ্রামের ওপর অঝোরে ঝরেনি।

অরুণ কাম্বলে

ভাঙন

১
হাজার হাজার হিরোসিমা
আমার দেহের ভেতর
সমানে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে,
আদিম বন্যতাকে সঙ্গে নিয়েই
আমার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে
টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে
এই শহর ।

এই শহর
যেন সার সার পড়ে থাকা
আমারই প্রস্ফুটিত রক্তের কুঁড়ি,
আর সেই রক্তের কুঁড়ি থেকে
প্রবাহিত হচ্ছে যে স্রোতধারা,
সেই স্রোতধারা
যেন আমাকেই ভেঙে খান খান করছে ।

২
বিধ্বস্ত নগরের বুকে দাঁড়িয়ে
আমি দেখেছি,
রোপণ-করা রক্তের কুঁড়ি,
দেখেছি
ঢের দিয়ে পড়ে-থাকা মূল্যহীন অস্তিত্ব,
যেঁ অস্তিত্বের স্রোতধারায়
আমি ভেসে চলেছি
মৃতদেহের মতো ।

আর এই যে আমার চোখ,
এই চোখকেই উপড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

এ চোখ যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ।

এই চোখে নেই শুধু রঙিন আবেশ,
এ চোখ ঘুরে ঘুরে
টহল দিচ্ছে চারদিক,
আর টহল দিতে দিতে এক এক করে চয়ন করছে
বাস্তবতার অজস্র রঙ।

এ চোখ যেন নিছক টলমল জল,
সারা পথ সেই জল দিয়ে করা হচ্ছে সিক্ত,
আর সেই জল
আমি আকণ্ঠ পান করব বলে
বিধ্বস্ত হিরোসিমাকে
স্থাপন করেছি আমারই কলিজার গভীরে।

৩
আমি মাটি খুঁড়ে দেখেছি
উন্মোচন
এবং বুদ্ধ হওয়া,
আর আমার দেহের ভেতর
হু হু করে বেড়ে চলেছে গাছ-গাছালি,
আগুনের মধ্যে ঘটছে
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ,
যেন প্রস্ফুটিত হচ্ছে
আগুনের লাভা।

নামদেব দসাল

পিতা ধাঙড়, আর আমি…

ধাঙড় পাথরে সৃষ্টি করে স্বপ্ন,
আর আমি,
আমার পিতার জীবনে জ্বালিয়ে দিই
ফুলঝুরি।

কথায় আছে
অতলে নেমে যেও না,
অথচ আমি ক্রমেই অতলে নেমে যাচ্ছি.
আর সমানে এখানে ওখানে
ঘসঘস করে
চুলকিয়ে চলেছি।

ধাঙড় পাথর দিয়ে
সৃষ্টি করে ফুল,
আর আমি বাজিয়ে চলি ব্যাণ্ড,
চারজন নারীর
খাঁজকাটা দেহের ভেতর থেকে আমি
খাসির মতো দাঁড়িয়ে-থাকা
পারসিকে জোর জোর লাথি মারি,
লাথি মারতে মারতে
আমার বাবার রক্তাক্ত পাছা দেখি।

অন্ধকারের অনন্ত মহাদেশে
দাঁড়িয়ে,
যতক্ষণ পর্যন্ত-না ঠোঁট জ্বলে যায়
ততক্ষণ আমি কষে চুরুট টেনে চলি,
আর হাঁফাই।

ধাঙ্গড় পাথরকে গাভীন করে,
আর আমি ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে
এক
দুই করে
গুনে চলি,
নিজেই নিজেকে টাঙ্গার সঙ্গে
যুতে দিই,
যুতে দিয়ে
বাবার মৃতদেহ স্পর্শ করি,
আর ক্ষোভে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠি।

ধাঙ্গড় পাথরের গভীরে
যেন থল-নলচের মতো
সমানে ঘুটে চলেছে নিজেকে।

আর আমি
বয়ে নিয়ে চলেছি পাথরের চাঁই।

ধাঙ্গড় পাথর দিয়ে তৈরি করে ঘর
আর আমি
পাথরে মাথা কুটে মরি।

ধাঙ্গড় মহারাষ্ট্রের অরণ্য-অঞ্চলের এক অনার্য উপজাতি। পাথর ভাঙা, কুয়ো-খোঁড়া ইত্যাদি কাজ করে কোন রকমে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।

ওদের সনাতন অনুকম্পা

ওদের সনাতন অনুকম্পা
ফাকল্যাণ্ডের ঝুপড়ির চেয়ে উঁচু নয়,
ওরা সত্যি সত্যি
ওদের নিজেদের জন্যে
আকাশে কোন সামিয়ানা খাটায়নি,
ওরা হচ্ছে উন্মুক্ত পরিবেশে
সামন্ত-সম্রাট,
তাই ওরা ওদের সিন্দুকের ভেতর
বন্ধ করে রেখেছে
সূর্যের আলোটুকুও।

ওরা ওদের দলিত-মথিত
উপেক্ষিত জীবনের জন্যে
ফুটপাতেও কোন মাথা গুঁজবার স্থান পায়নি,
মানুষের মতো বেঁচে থাকার
যে তীব্র যন্ত্রণা,
সেই যন্ত্রণা
ওদের করে তুলেছে অসহায়,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাঁক
ওদের যে যকৃৎ,
সেই যকৃৎকে ভরাট করার জন্যে
ওদের কাছে নেই এক ফোঁটাও মাটি।

আগামী যে ন্যায়সঙ্গত দিন,
সেই দিন যেন হাত প্রসারিত করে
নিচ্ছে ঘুষ,
আর এসব কিছুকেই দিচ্ছে
মদদ।

আর ওরা ওদের খুন-হয়ে-যাওয়া
দেহের ওপর
ওদেরই যে দরদী হাত,
সেই হাত থেকে গড়িয়ে পড়তে দেয়নি
সামান্যতম 'আহা' শব্দটুকুও।

জনপ্রতিনিধি

একজন জনপ্রতিনিধি,
যে আমাদের দুঃখ-কষ্ট
আর দরিদ্রতাকে হাতিয়ে
নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে,
বিজয়ী হয়ে
সংসদে কয়েক মাস ধরে
যাওয়া-আসার পর
সে আমাদের কাছ থেকে
দূরে সরে গিয়েছে।

একদিনের কথা বলছি,
সরকারের তৈরী ডবল-ঘোড়ার
পুরো বোতল
আমি ঢক ঢক করে গলায় ঢালি,
গলায় ঢেলে
শালা, আদমির মতো আদমি আমি
দেখতে দেখতে যেন
ঘোড়ায় পালটে যাই।

তখন আমি নেশায় চুর,
আর সেই হারামিকে খুঁজতে খুঁজতে
এক বিরাট হোটেলের
পারমিট রুমে আমি সটান ঢুকে পড়লাম,
আমার সঙ্গে ছিল
টাটা-বিড়লার সবে জন্মানো এক নাতনি।

হারামি, তখন গলায় ঢালছে হুইস্কি।

হারামিকে দেখেই
আমার ইচ্ছে হল,
তখনই ওকে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে
খুন করে ফেলি,
কিন্তু শালা, আমার কাছে
দশ-পয়সা দামের একটা ব্লেড পর্যন্তও নেই

হারামজাদা, কুত্তার মতো
একটা গ্লাস এগিয়ে দিল
আমার দিকে।

আমি ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর
আমার মনে হল,
আমি নেহাৎই একজন কবি,
—একজন ভিখেরি।

আমার ঠিক মনে নেই
মার্কস কেন যেন বলেছিলেন,
আমাদের শৃঙ্খল ছাড়া
হারাবার আর কিছুই নেই।

অথচ এই হতভাগা দেশে
এখনও
শৃঙ্খল হারানোর কোনো অধিকার
আমাদের হয়নি।

কারণ, আমরা সবাই নেশায় চুর,
কারণ, আমরা সবাই কবি
কারণ আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে
পারমিট আর পারমিট,
আর জনপ্রতিনিধিরা বিকিয়ে দিয়েছে
তাদের নিজেদেরই সত্তা।

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে
মাটির গভীর থেকে উঠে এল
বিংশ শতাব্দীর এক শহর।

কাগজের ফর্দের মতো এই শহর
আমার হাতের বিরাট মুঠোর মধ্যে
দলা-মোচড়া পাকিয়ে গেল।

বোঁ বোঁ করে ঘুরছে
যন্ত্রের চাকাগুলি,
বিড়ির টুকরোর মতো
কারখানার চিমনি,
যেন দরাজ গলায় ঘোষণা করছে
যন্ত্রযুগের পদশব্দ,
আর সব, সব কিছুই যেন
মৃতনগরী মহেঞ্জোদড়োর মতো নিস্তব্ধ,
নিঝুম।

যেখানে ইচ্ছে
হাত খানেক খুঁড়ে ফেল,
পাথর কুঁদে তৈরি মূর্তিতে মাখা সিঁদুর,
কোন মূর্তির মুখে শুঁড়,
কোনটার বা মাঝ বরাবর
ভেঙ্গে গিয়েছে লেজ সমেত।

এ আর এমন কি খারাপ ব্যাপার!

এ বছর যাদুঘরের পেল্লাই দালান

বেশ পরিপাটি করেই সাজানো হয়েছে,
ত্রাসে পরিপূর্ণ ধর্মের যে ভড়ং
তা যেন আগামী পুরুষের কাছে
নিজেকেই জাহির করে চলেছে।

এই ফলকে কি লেখা আছে
তাকিয়ে দেখ :
সমস্ত বর্ণ
সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্যেই হাট করে খোলা
যেন মানুষ মানুষেরই মধ্যে
মাটির হাঁড়ি-কলসির মতো
নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত থরে থরে সাজানো।

এমন এক শহরকে
মাটির নিচে দফন করা
তেমন কোন অন্যায় কাজ নয়।

কেমন দেখতে সেই যন্ত্রযুগ ?
এই যন্ত্রযুগ যেন
বিংশ শতাব্দীর ঘোড়ার দর্শন।

চড়ুই পাখি

দেবতাদের বন্ধ্যা গপ্পের মতো
যেন সমুদ্র।

সেই সমুদ্রের নোংরা,
ঘোলাটে অসংখ্য তরঙ্গরাজি,
সমুদ্রের হাঁটু জলে ঠায় দাঁড়িয়ে
চড়ুই পাখি।

চড়ুই পাখির
নাকে-মুখে ঢুকছে
জল।

গতকালই
ও সবে পাঠশালা থেকে ফিরে এসেছে,
আর সমানে বলে চলেছে
চিলয়ার কাহিনী :

দেবতা কেন এত দুষ্টু,
কেন সে চিলয়ার রক্ত-মাংস খায় !

আমার হৃদয়
দুঃখে, ব্যথায় খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায়।

বিরাট দেবতার হাঁ-করা চোয়াল
কেন চড়ুই পাখিকে
গিলে খায় ?

আত্মারাম কাণিরাম রাঠোড়

আর কতো দিন

বলো, আর কতো দিন আমাদের বলবে
দলিত…
আর কতো দিন
আমাদের ইনিয়ে-বিনিয়ে পড়তে হবে
এই একই অধ্যায়,
আর কতো দিন দেখাবে
আমাদের অশেষ করুণা,
বলো আর,
আর কতো দিন আমাদের তালিম নিতে হবে
শিকারী কুত্তার আদব-কায়দা।

তোমরা যারা আমাদের
এসব তালিম দিচ্ছ,
তাদের জানা উচিত
এ দাওয়াই-টাওয়াই-এ
আর কোন ফয়দা হবে না।

হয়তো এসব কিছুই তোমাদের অধিকারে,
তোমরা
তোমাদের নেতৃত্ব রাখার জন্যে
তোমাদেরই ফেলে-আসা দিনের যে কর্তৃত্ব
সেই কর্তৃত্বের অগাধ ঐশ্বর্য হয়তো
এসব কিছু!
হতে পারে এ সবই তোমাদের বর্ম,
কিন্তু তোমাদের সমস্ত সম্পদই
দীর্ণ, জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এখন আর এসব
তেমনি আদ্যিকালের মতো
অটুট থাকতে পারে না।

বাঘের যে বাচ্চা,
সেই বাচ্চাকে শিকার ধরার জন্যে
কোন রকম তালিমের প্রয়োজন নেই।

কিভাবে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়
তা সে জানে।

শুধু অপেক্ষা করতে হবে
কখন সে টান টান করে
চোখ মেলে তাকাবে।
মাত্র তো তেরোটি দিন,
তেরোটি দিন পরেই
সে নিজে-নিজেই চোখ মেলে তাকাবে।

নিজেকে জাহির করতে গিয়ে

মা
আর বাবার কাছ থেকে
আমি যে জাত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি,
তা জানাতে গিয়ে
আমি যখন লিখি :
'পিছিয়ে পড়া জাত',
তখন আমি নিজেই নিজের ওপর
রাগে ফেটে পড়ি।

আমি মোটেই মিথ্যে বলছি না,
বলছি যা কিছু নির্ভেজাল সত্য,
সেই নির্ভেজাল সত্যই আমার মধ্যে
মাথা তুলে দাঁড়ায়,
কোথাও প্রতিদিন মজুরি পাই
দেড় টাকা,
বলো, তবে সাত দিনের মজুরি কতো হয় ?
পড়শি বুড়ি
মজুরি হিসেবে কখনও পায়
সাড়ে ন' আনা,
কখনও বা পায় সাড়ে সাত আনা···

আর গোপুর ঠাকুর্দা
তিন-কুড়ি টাকা কর্জ করে
বছরে একশ' টাকা সুদের হারে।

আমি মাথা মুণ্ডু
এসব হিসেবপত্রের
কিছুই বুঝতে পারি না।

আমি রাগে আগুন হয়ে যাই,
কিন্তু নিজেকে 'পিছিয়ে-পড়া জাত'
লিখতে গিয়ে
দেখি
কোন কিছুই দাউ দাউ করে
জ্বলে ওঠে না।

বামন নিম্বালকর

আমার মৃত্যু

আকাশ
যখন লাফিয়ে নামে
আমারই বস্তির ঝুপড়ির ওপর
তখন আমার মৃত্যু হয়,
সীমাহীন যন্ত্রণায় ভরপুর
আমার জীবন,
যারা এখনও বেঁচে আছে
তাদের মধ্যেই রয়েছি
আমি,
রয়েছে আমার মৃত্যু।

আমার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে,
অথচ আমার সেই মৃতদেহ
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে ফেলার জন্যে
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
এক টুকরো শুকনো জমিও।

থিক থিক কাদার মধ্যে
লতপত করছে
আমার আধ-জ্বলা দেহ,
যেন আমার আর একবার মৃত্যু হয়
আমারই মৃত্যুর পর,
যেমন আমার বারবার মৃত্যু হয়েছে
আমারই বেঁচেথাকার মুহূর্তগুলিতে।

মৃত্যু
কিম্বা জীবন,

যা ইচ্ছে তুমি বলো না কেন
আমার অন্ত একই রকম,
মনুর এই দেশে
প্রবাদের মতো একটি কথা আছে :
জন্মের মুহূর্ত থেকে
অস্পৃশ্যতাকে আমি এনেছি সাথে করে।

আমার যদি একান্তই মৃত্যু হয়,
ওদের তাতে কি এসে যায়!

আমার মৃতদেহের ওপর কি রাখা হয়েছে?

বুঝি তাই
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
এক টুকরো শুকনো খটখটে মাটি।

আমার মৃতদেহ
আধ-জ্বলা অবস্থায়
পড়ে আছে থিক থিক কাদার মধ্যে,
কারণ
আমার মৃতদেহের ওপর
তখনও ছিঁড়ে পড়ছে
আকাশ।

রাম দোতাংডে
মহফিল

ফুলের মালা দিয়ে
কী সুন্দরই না সাজানো
ম ম মহ্ফিল,
আর সেই মহ্ফিলে আমি ।

আমি যে তোমারই ক্ষত-বিক্ষত
জঙ্ঘা,
তাই আমি বলতে চেয়েছি
তোমারই দলিত-মথিত
স্তনের কথা ।

ওরা তাই বিদ্যুতের মতো
ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার ওপর,
ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায়
আমার সামনে,
আর কালো ঝাণ্ডা নিয়ে
এগিয়ে আসে আমার দিকে ।

আমার মাথার ওপর বিশাল উলঙ্গ আকাশ
আর সেই আকাশের মতোই
যেন উলঙ্গ,
উলঙ্গ ওরা ।

মীনা গজভিয়ে

গভীর অন্ধকারের চেয়েও গভীরতর

গভীর অন্ধকারের চেয়েও
ভয়ঙ্কর
এখানকার উজ্জ্বলতা,
যেন প্রতিটি মুহূর্তের সেই উজ্জ্বলতা
তার চোয়াল হাঁ করে আছে,
আর যেন গিলে খাচ্ছে
আলোর উত্তরপুরুষদের,
শকুনের ঠোঁটের ঠোকরে ঠোকরে
টুকরো টুকরো
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ,
আর এখন এই ভাঙাচোরা,
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ যেন আর চেনাই যায় না।

আর,
আর তখনই আমি সৃষ্টি করব
সেই অসাধারণ সুন্দর প্রতিমূর্তি,
(যে প্রতিমূর্তির কোন মুখাবয়ব থাকবে না)
মাথাটাকে ধাক্কা দিয়ে
ফেলে দেব
অন্ধকারের অনন্ত পেটে
আর ভরাট করে দেব
অন্ধকারের সেই অনন্ত পেট
বেদ-মন্ত্র
আর যাগ-যজ্ঞের উপাচার দিয়ে।

এই বস্তিতে
শুধু টালি আর টালির ঘর,
মাপা-জোকা পথ-ঘাট
আর আছে কিছু বাগ-বাগিচা।

যেন এই বস্তি
মানুষ-সৃষ্টির এক অসাধারণ কামারশালা,
জানি না,
এখানে মন কোন্ ছাঁচে
ঢালাই হয়ে চলেছে,
ঠোঁটে হাসির আলতো ঝিলিক
পেটে দারুণ গরল।

কথা
আর কাজের মধ্যে
কতটুকু ফারাক থাকা দরকার
তা আমার জানা নেই,
কিন্তু সব কিছুই
ঠিক তেমনি ভাবে চলেছে।

সেই
একই পাহাড় আর পর্বত
সেই একই মুখাবয়ব
কিন্তু কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,
যেন কবচ পালটে
বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।
গান গেয়ে গেয়ে
আমাকে জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ,
আর আমি আমার খুশির আমেজকে

বীজের মতো রোপণ করেছি
মাটির নিচে,
রোপণ করেছি বলেই
সেই কবে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে
প্রতিকারের জন্যে প্রস্তুতি।

আমি আতঙ্কিত
আমি শঙ্কিত
হয়তো বা এই একটি-দুটি বীজ থেকে
কথার জন্ম হতে পারে,
কিন্তু সেই বীজ থেকে
একদিন অঙ্কুরিত হবে
পিপুল গাছ!

মলিকা অমর শেখ

'দুহেজু' : এই শব্দের সম্ভারে

'দুহেজু'—এই শব্দের সম্ভারে
ওরা সবাই মিলে আমাকে জানিয়েছে
স্বাগত,
সেই আদিমকালের মেটেৌল আলোর
পায়ে-পায়ে চলার সরু পথের যে নিশানা,
সেই নিশানার দিকে
আমাকে ওরা পথ দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম :
আমার কাছে এ যে অনেক,
অনেক কিছু।

ওদের যে আক্রমণ,
সেই আক্রমণও ওরা করেছে
ওদের আদিম কায়দায়,
আর সেই আদিম কালের কাঁটাতেও
ধরেছে মরচে।

থু থু ফেলার মতো ছুঁড়ে-দেয়া দৃষ্টিকে
থোরাই পরোয়া করে
আমি যেখান থেকে এসেছিলাম
সেখানকার সত্তা
সেখানকার সমস্ত অস্তিত্বকেই
আমি লণ্ডভণ্ড করতে লাগলাম।

পচা, দুর্গন্ধময় নালা-নর্দামার মধ্যে
আমি খুঁজে পেয়েছি
আমার নতুন জীবনকে,

আর এখানকার নর্দমার পাঁকে পাঁকে
কিলবিল করছে সদ্যজাত পোকা-মাকড়।

আমি খুশিতে
বুক ভরে শ্বাস টানছি,
আর এখান থেকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে
রাত্রির চাঁদকে।

'হুহেস্থু' শব্দের অর্থ, যে নারী দ্বিতীয়বার অন্যপুরুষের সঙ্গী হতে বাধ্য হয়।

অর্জুন কামবলে
ওরা যে এখনও বেঁচে আছে

ইতিহাসের খুনী যোদ্ধা,
যেন ত্বকের গভীর থেকে গভীরে
চলে গিয়েছে,
যেন রক্ত আর হাড়ের পুটলি
যেন স্মৃতির-হাওয়া বন্ধ-করা ডিব্বার মধ্যে
বৃদ্ধ মস্তিষ্কের সাথে
জড়াজড়ি করে রয়েছে।

অন্ধকারের গোঙানির মধ্যে
চলেছে
জান-কবুল-করা এক ঘোড়-দৌড়,
গতকালই উঠেছে যে সূর্য
সেই সূর্য করছে জ্বল জ্বল
টগবগ টগবগ করে ফুটছে,
আর নিমেষে কি যেন করে চলেছে
সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের ওপর,
উজ্জ্বলতা মেলে ধরেছে তার দু' চোখ,
তোতলানো জবান
আর মস্তিষ্ককে করেছে শৃঙ্খল মুক্ত
বুক-ভরা নিঃশ্বাস থেমে রয়েছে
আমার বুকের মাঝখানে,
আর আমার মাথা স্পর্শ করেছে
আকাশকে।

হাঁ, ওরা এখনও মরেনি,
বেঁচে আছে।

জ. বি. পাওয়ার

কৈফিয়ৎ

আমার যত হাতিয়ার
সবই ওরা
গতকাল
আর পরশু
ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

আর তা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর
আজই ওরা আমাকে
তুলেছে কাঠগড়ায়।

ফুল নিয়ে খেলার যে বয়স,
সেই বয়স থেকেই খেলতে শুরু করেছি
জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে।

উন্মুক্ত হাওয়ায়
হৈ হৈ রৈ রৈ করে ছোটাছুটি করার যে বয়স
সেই বয়স থেকেই
আমি রয়েছি কারগারে বন্দী হয়ে।

আমার পাঁজরগুলোই না হয় নাও

তোমার রেডিমেড সিঁড়ি চাই, তাই না ?
আমার পাঁজরই তবে না হয় নাও না।

'স্রেফ চব্বিশটি'—বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছ কেন ?
ও হো, বুঝেছি, তুমি আটচল্লিশ তলায়
উঠতে চাও!

ওদের পাঁজরের এই কড়মড় কড়মড় শব্দ
তোমার বিরুদ্ধে কোন রকম
প্রতিবাদই জানাচ্ছে না।

ওরা যদি ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়,
তবে না হয়
টমির খাবারের থালা থেকে
ছুঁড়ে দাও
এক টুকরো গোস্ত।

পাঁজরের ওপর যে রক্তিম আভা ছড়িয়ে রয়েছে
সে আভা মৃত-রক্ত কোষেরই।

আমি সমানে চিবিয়ে চলেছি
কালাকাণ্ডির সবুজ পাতা।

আমাকে যদি
সাচ্চা কথা বলতে হয়,
তবে বিনা দ্বিধায় বলব :
তোমরা বাংলোতে থু থু ফেলার জন্যে
ওরা এই পাঁজরগুলোকে চিবুবে
জাফরান-দেয়া বেনারসি পানের মতো।

প্রকাশ জাধব
কবি

যা কিছু সাচ্চা,
তার ওপর কোনরকম দৃষ্টিপাত না করেই
গোবেচারা কবির হাতে
পরিয়ে দেয়া হোক
হাতকড়ি।

দশটি
বা পনেরোটি সন্দিগ্ধ পঙতিকে
বেআইনী ঘোষিত করে
আসল যে শব্দ,
সেই শব্দের অর্থের ওপর লাগানো হয়
শীলমোহর,
টাকার পেছন দিয়ে
নিয়ে আসা হয়
খাকির উঁদি।

আর সেই খাকির উঁদি
চারদিকে ছড়িয়ে দেয়
শোকগ্রস্ত অন্ধকার।

আর তখনই
গর্ভবতী দহনীয় এক রাতকে
আমি উলঙ্গ করে ফেলি
কবিতার অনন্ত গর্ভে।

সমরকন্দ
বা খুসকীর যে পথ,
যে পথ দিয়েই হোক না কেন
আমরা এসেছি
বাইবেল
কোরাণ
আর ছক্কা-পাঞ্জার ওপর দিয়ে
আজ এখানে,
এই অব্দি।

এই দেশে
কে দেখেছে সেই তুমুল যুদ্ধ,
যে যুদ্ধ হয়েছিল
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে।

পাথরের যে হাতিয়ার
একদিন সৃষ্টি হয়েছিল,
সেই সৃষ্টির কথা স্মরণ করে
কোন্ ইতিহাসকার সেদিন
বা আজ
লিখে রেখেছে :
'সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ।'

আর একদিন
সেই সভ্যতাই প্রথম এগিয়ে এসেছিল
মানুষকে ধর্ষণ করার জন্যে।

গণতন্ত্র
— কবিতা তো ওদের জন্যে নয়,

কারণ ওদের জন্যে নেই
রুটির একটি টুকরোও।

কে ছিনিয়ে নিয়েছে ওদের রুটি
ওদের আত্মজা
আর ওদের হাতের লাঠিটাকেও।

কোন্ সে সান্ত্রী
যে একান্তে নিজের জন্যে
স্রেফ প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্যের
যে উলঙ্গ ময়দান,
সেই ময়দানে করেছে জল্পনা-কল্পনাহীন
এক বিদ্রোহ,
আর অসংখ্য পাজির-পাঝাড়াদের গর্দানকে
মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে
কোন্ সে মানুষ আকাশের দিকে তুলে ধরেছে
তাদের দু' হাত,
আর তাদের মুখের আদল দেখতে যেন
পাঁচ-পাঁচটি মৃত মানুষ
বা দশ-দশটি আহতের থেকে
বিলকুল ফারাক।
যেন ঘোমটা-তোলা
কোন লজ্জাবতীর মুখ,
হয়তো একদিন সে মুখ
বেহায়ার মতো পালটে যাবে।

আর
কত অনায়াসেই না
একটা শিশুর ওপর আর একটা শিশুকে
এক দুই তিন করে
তোমরা পর পর চড়িয়ে দাও।

কিন্তু
আসলে ওরা তো শিশু নয়,
ওরা তো ওদের মৃত কাঁধের ওপর
উঠিয়ে নিয়েছে
অবিকশিত সেই শতাব্দীকে,
আর নিজের গর্ভবতী রক্তের মধ্যে
রেখেছে সেই মাদা-আণ্ডাকে।

বলো,
এই অত্যাচারীদের
একেবারে লোপাট করে দেয়ার জন্যে কি
ওদের দিল এতটুকু উসখুশ করে না!

ত্র্যম্বক সপকালে
আমি তবে কি করব

আমি কি জন্যেই বা এখন কাঁদছি ?
কোথায় আমার চোখের টলমল জল ?

আমার চোখের শুকনো পলক থেকে
এখন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
বিদ্রোহের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ,
যদি এ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে
জ্বলে ওঠে
বলো, তবে আমি কি করতে পারি ?

আমার জীবনের সমস্ত পথ-ঘাট,
সমস্ত অলি-গলিই
তুমি রুদ্ধ করে দিয়েছ,
মৃত্যুর কার্নিশ থেকে
তোমার কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়
যদি আমার দাঁত
তোমার গলায় গেঁথে যায়
বলো, তবে আমি কি করতে পারি ?

হিন্দু সংস্কৃতির আখ মাড়াইয়ের কলে
ছোবড়ার মতো হয়ে গিয়েছে
আমার হাড়-মাস,
আমার হাড় মাসের সঞ্চিত রস থেকে
সৃষ্টি হয়
যে ঝোলা গুড়
তা যেন
আমারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে রুখে।

ছায়ায় এসে দাঁড়ালে
আমার এই ছোবড়ার মতো দেহ
ওঠে তেঁতে,
তাই বলছি
এই শুকনো খটখটে ছোবড়ার সাথে
যদি ভেজা-ভেজা কোন কিছু
দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে,
বলো, তবে আমি কি করব,
কী-ই বা করতে পারি !

এখন,
কি জন্যে তুমি তোমার কোমরে
ধুতির গিট বাঁধছ ?
তোমার ফাতা-ফাতা কাপড়ের
টুকরো-টাকরাই বা কোথায় ?

স্বাধীনতাকে টেনে-হিঁচড়ে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে
স্বাধীনতার এই চার দশকে
আমরা সবাই পেয়েছি স্বাধীনতার রোশনি।

আমি এমন এক দিগম্বর,
যে সেই আদিম-মায়ার পেছনে
ছুটতে ছুটতে
যদি স্বয়ং সেই উলঙ্গতাকে দেখে
ভয়ে আঁতকে উঠি
বলো, তবে আমি কি করব,
আমি কী-ই বা করতে পারি !

আমার এই পেটটাই
যেন একটা গোরস্তান,

সমস্ত ধর্মের ধর্মগ্রন্থই
সেখানে চির নিদ্রায় শায়িত।
আমার পেটের সীমানা প্রসারিত হতে হতে
যদি এই ধরিত্রীকেই ঢোক গিলে খেয়ে ফেলে,
বলো, তবে আমি কি করব,
কীই বা করতে পারি!

ফুলতন্ত্রী ছিন্ন-ভিন্ন করে
তুমি আমাকে আমার জীবন-প্রবাহ থেকে
মুক্ত করে দিয়েছ।
হে ভারতমাতা, তুমি আমাকে কবে, কখন
দিয়েছ তোমার ভালোবাসা?
এই কাল-প্রবাহে আমি তো কর্ণ নই,
বরং বলতে পার ইডিপাস,
ইডিপাস হয়ে
আমি যদি তোমার শয্যায় শুই,
বলো, তবে আমার কীই বা করার আছে?

তুমি আমাকে 'অ্যাবে' বলে ডাকলে

তুমি আমাকে 'অ্যাবে' বলো ডাকলে,
আমি জবাব দিলাম:
'কি হে', বলে।
তুমি আমার এ জবাব সহ্য করতে পারলে না,
আমি তোমার চোখে চোখ রাখলাম
কিন্তু তুমি তা দেখতে পেলে না,
তোমার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ালে
তুমি ঘৃণায় সিঁটকিয়ে গেলে।

‘অ্যাবে’, শোন,
তোমার কন্যার নাম হচ্ছে
‘গণ-অধিকার’,
তোমার সেই কন্যা এখন
ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে,
আর তার প্রথম বর হওয়ার জন্যে
আমিই এগিয়ে গিয়েছি !

অধিকারের সাথে সম্ভোগ
আর মধুযামিনীর যে আনন্দ
তা থেকে আমি এখনও বঞ্চিত।

ওর আর আমার যে মিলন,
সেই মিলন থেকে সৃষ্টি হবে
এই দেশের সাচ্চা প্রজাতন্ত্র,
আর সেই প্রজাতন্ত্র
একদিন ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হয়ে উঠবে।

'ওঠো
জাগো
তোমার দুনিয়ায় সূর্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।'

কে যেন ওদের ঘুম থেকে
জাগিয়ে তুলল,
আর ওরা উঠে বসল
চোখ রগড়াতে রগড়াতে,
তাকিয়ে রইল উদ্ভাষিত সূর্যের দিকে।

ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল,
দেখল
চারদিকে শুধু অন্ধকার
আর অন্ধকার,
যেন অনাদিকালের
ভয়ঙ্কর অন্ধকার।

ওরা ভাবল
হয়তো বা সূর্য উদ্ভাষিত হয়ে উঠবে।
ওরা হা করে তাকিয়ে রইল
একদিন
দুদিন,
দীর্ঘ কুড়িটি বছর।

ওদের জন্যে
সূর্য কোন দিনও পুব-দিগন্তে মাথা তোলেনি,
যখন সূর্য পুব-দিগন্তে মাথা তুলেছিল

তখন কিছু মানুষ
সে-সূর্যকে কিনে নিয়ে
তাদের আলিশান প্রাসাদে
বন্দী করে রেখেছিল।

ওদের সূর্য হয়তো
এখনি
পুব-দিগন্তে
আবীরের মতো রঙ ছড়াতে ছড়াতে
মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ছাউনি থরথর করে কাঁপছে

তুমি জমজমাট চৌমোহনীতে
উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলো :

সপ্ত সুরের ঝংকারে উজ্জীবিত তোমার গান

তুমি নামিয়ে নাও তোমার হাত,
কেনই বা তুমি হাত পেতে চাইছ
ওদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম !

ভালোই করেছ,
তুমি তোমার গানের সুর
এক খাদ থেকে আর এক খাদে
নিয়ে গিয়েছ,
কিন্তু তুমি কেন হয়ে উঠেছ
এমন তিরিক্ষি মেজাজের !

দোস্ত্, শুধু সুরের ঝংকারকেই নয়,
এখানকার যে সূর্য,
সেই সূর্যকেও পালটে নিতে হবে
তোমাকে।

আমি জানি,
দমকা হাওয়াতে
তুমি কোন কিছুই লিখতে পারবে না
তোমার দিনপঞ্জীর পাতায়,
কিন্তু তোমাকে রাখতে হবে
ঝড় আর ঝঞ্ঝার নিখুঁত হিসাব-নিকাশ।

কিন্তু, তবু তুমি উদাত্ত কণ্ঠে
গেয়ে চলেছ
মুক্তি বাহিনীর
কিম্বা ভিয়েতনামের মানুষের একজন হয়ে।

তুমি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলো
চবদার দিঘির একজন সত্যাগ্রহী হয়ে।

তুমি গেয়ে চলেছ…
গেয়ে চলেছ,
যতক্ষণ না ওরা পিছু হটছে
ওদের সুরক্ষিত সূর্যের দিকে।

তুমি গেয়ে চলো
তুমি গাও,
তোমার অনন্য গানে
থরথর করে কেঁপে উঠছে সামরিক ছাউনি,
আর কাঁপতে কাঁপতে
তা ভেঙে পড়ছে।

মহারাষ্ট্রের চাবদার দিঘির পাড়ে ডঃ আম্বেদকর প্রথম সত্যাগ্রহ করেন।

কেশব মেশ্রাম
তাণ্ডব নৃত্য

রঙ্গমঞ্চের ওপর
আমি আমার পা রাখার সাথে সাথেই
বেজে উঠল
উদ্দাম জয়ঢাক,
আর গাছে গাছে ঝুলন্ত চামচিকার দল
ভীষণভাবে চমকে উঠল,
ঝোপ-ঝাড়ে আত্মগোপন করে-থাকা
জোনাকিরা
কোনো এক আদিম ভয়ে ভীত হয়ে
উড়ে গেল।
ওদের পুচ্ছে জ্বল জ্বল করছিল রোশনি,
আর ওদের সেই রোশনির
যেন মনে হল :
আমার এই প্রথম এণ্ট্রিতেই
অন্ধকার দপ দপ করতে করতে
ফেঁটে চৌচির হয়ে গেল।
'সেতার বেজে উঠল
তরঙ্গের অনন্ত শব্দের মতো,
আর শঙ্খে উঠল ভেরির গমগম আওয়াজ।'

সজ্জিত বন্দুক দিয়ে
পরিপূর্ণ করা হয়েছে অস্ত্রাগার,
কে যেন আত্ম-বিদ্বেষের মৌচাক
ঠেসে দিয়েছে
আমার কণ্ঠনালির ভেতর,
নিচু হয়ে ঝাড়ু দিতে দিতে
আমার মেরুদণ্ড একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে,

আর আঁকাশচুম্বী-দীপস্তম্ভের
সমস্ত প্রদীপই নিভে গিয়েছে
এক লহমায়।

মাছির মতো ভনভন হাওয়া
গভীর অন্ধকারের কোটরে
দশমীর আহত মোষের মতো
যেন ছটফট, ছটফট করছে ;
খাদ্যের জন্যে বেরিয়ে-আসা
ওদের আকুল জিভকে
করা হয়েছে প্রদীপ,
আর সেই প্রদীপে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে
কর্পূরের অগ্নিশিখা।

আমি
মঞ্চে পা ফেলার সাথে সাথে
জোর জোর শব্দের আলোড়ন তুলে
বেজে উঠল জয়ঢাক,
আর সেই শব্দে
কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে
পাতার রঙ।

ওৎ পেতে বসে-থাকা
হিংস্র জানোয়ারের দল
চেপে ধরল
তাদের বুকের ওপর ঝোলানো পৈতা,
ওরা নিজেকে লুকিয়ে-ছুপিয়ে
এক,
দু' পা করে নিঃশব্দে এগিয়ে এল,
ওদের খাবারের পাত্রে দেয়া হল

পানীয় জল
আর খাবার,
এই জল
আর খাবার দেখে মনে হল
এসব যেন শ্মশানবাসী মহাদেবের প্রসাদ।
ওদের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান দেয়া হল,
আর ওদের ধকধক হিংস্র চোখ
অঙ্গারের মতো উঠল জ্বলে।

ওরা
ওদের অভ্যস্ত স্বভাবের মতো
দক্ষিণা নেয়ার জন্যে
পেতে দিল ওদের পাঞ্জা।
আর আমি
একলব্যের অঙ্গুষ্ঠের ছাপ-দেয়া
একটা চিরকুট
তুলে দিলাম ওদের প্রসারিত পাঞ্জায়।

আমার একতারার তালে তালে
ওরা তাল মিলিয়ে চলল,
আর আমি
মঞ্চের ওপর সমানে নেচে চললাম
তাণ্ডবনৃত্য।

আমি নেচে চললাম…